১১ মাফিয়ার নিয়ন্ত্রণে মংলা বন্দর

লিখেছেন **সাজেদুর রহমান**

খুলনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের পোতাশ্রয়ে ১৯৫৪ সালে স্থাপিত মংলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর। রূপমহিমায় ঘেরা প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত এ বন্দর ৫০ বছরের মাথায় এসে আজ কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে। বন্দরে জাহাজ আসছে খুব কম। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণচাঞ্চল্য তেমন নেই। দিনকে দিন বন্দরটি পরিণত হচ্ছে লোকসানি প্রতিষ্ঠানে। বন্দর নিয়ন্ত্রণ করছে কতিপয় প্রভাবশালী। তাদের দৌরাত্ম্যে আমদানি-রপ্তানিকারকরা সহজে মংলা বন্দর ব্যবহার করতে চায় না। ফলে ২০০৪ সালে মংলায় জাহাজ ভিড়েছে মাত্র ১৫৪টি এবং ছেড়ে গেছে ১৫১টি। এতে গত অর্থবছরের প্রথম ৬ মাসে বন্দরটি থেকে সরকারের লোকসান হয় প্রায় ২ কোটি টাকা। জাহাজের আনাগোনা কমে যাওয়ার কারণে বন্দরে এখন দৈনিক ৫০ হাজার টাকার মতো লোকসান হচ্ছে।

অথচ এক সময় মংলা বন্দরটি লাভজনক ছিলো। ২০০০-০১ অর্থবছরেও বন্দরটি সরকারি রাজস্ব খাতে ৭৫ কোটি ৮৬ লাখ ১৬ হাজার টাকা জমা দিয়েছে। এরপর থেকে বন্দরের আয়ের পরিমাণ ক্রমশই কমতে থাকে। মংলায় এই স্থবিরতার জন্য সরকার, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সংগঠন পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছে। সরকার দাবি করছে, অসাধু বন্দর কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের দৌরাত্ম্যের কারণে কোনো জাহাজ কোম্পানি বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে চায় না। এছাড়া সরকার বন্দরে নাব্যতা হ্রাস, শ্রমিক অসন্তোষ, শিল্পজাত পণ্যের অভাবকেও দায়ী করছে।

অন্যদিকে বন্দর কর্তৃপক্ষ বলছে, খুলনার পাটশিল্পকে কেন্দ্র করে মংলা বন্দরটি গড়ে উঠেছিল। খুলনার পাট শিল্প বন্ধ হওয়ায় বন্দরটিরও কার্যকারিতা অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। এ জন্য কর্তৃপক্ষ সরকারের ভুল শিল্পনীতিকেই দায়ী করছে। একই সঙ্গে শ্রমিক সংগঠনকেও তারা দোষারোপ করছে।

এরকম পারস্পরিক দোষারোপের মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে। গত ১১ জানুয়ারি কমিটির দ্বাদশ বৈঠকে বন্দর স্থবির হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হয়, ‘১১ মাফিয়া মংলা বন্দর নিয়ন্ত্রণ করছে’।

কমিটির চেয়ারম্যান গোলাম মোঃ সিরাজ সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, এই ১১ জনের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির কারণে বন্দরে আসা জাহাজগুলো নানাভাবে নাজেহাল হয়। ফলে বন্দরে কোনো কোম্পানি জাহাজ নোঙর করাতে চায় না। কিন্তু তিনি এই ১১ মাফিয়ার নাম-পরিচয় প্রকাশ করেননি। বরং বলেছেন, মংলার গোয়েন্দা সংস্থা এ নামের তালিকা করেছে।

মংলায় এনএসআই, ডিজিএফআই এবং ডিএসবি এই তিনটি গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে। সংস্থাগুলোর পৃথক তালিকায় সব মিলিয়ে ১৬ জনের নাম পাওয়া যায়, যারা মংলা বন্দর নিয়ন্ত্রণ করছে বলে জানা গেছে। তবে প্রতিটি সংস্থার তালিকায় প্রথম ১১ জনের নাম অভিন্ন পাওয়া যায় যাদেরকে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ‘মাফিয়া’ বলে অভিহিত করেছে। এদের মধ্যে ৩ জন আমদানিকারক এবং ৮ জন শ্রমিক নেতা।

১১ মাফিয়া

গোয়েন্দা সংস্থা সবরাহকৃত মাফিয়া তালিকায় ৩ জন আমদানিকারকরা হলেন ব্রাইট শিপিং এজেন্সির স্বত্বাধিকারী নজরুল ইসলাম, এ হোসেন গ্রুপের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন এবং ম্যাক শিপিংয়ের মালিক কামরুল ইসলাম।

মাফিয়াচক্রের মধ্যে যেসব শ্রমিক নেতার নাম পাওয়া যায় তারা হলেন শ্রমিক সংঘের বর্তমান সভাপতি খলিলুর রহমান, সহ-সভাপতি আবুল খায়ের সর্দার, শ্রমিক নেতা মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে লোহা রফিক, শ্রমিক সংঘের সাবেক সভাপতি শাজাহান শিকারী, সাবেক সহ-সভাপতি চান মিয়া, স্থানীয় চরমপন্থি নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন, শ্রমিক নেতা আব্দুস সামাদ এবং মোঃ নূর আলম।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে, আমদানিকারকরা এসব শ্রমিক নেতাকে দিয়েই জাহাজ আটক ও জাহাজের মাল নষ্ট করার কাজ করে থাকেন। এসব কাজে প্রচুর অর্থ লেনদেন হয়। তার ভাগ পায় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। বন্দর কর্তৃপক্ষের একশ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তাও এর সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ আছে। তালিকাভুক্তদের কারো

কারো সঙ্গে কথা বলে এটা বোঝা গেছে, প্রত্যেকেরই রাজনৈতিক আশ্রয় আছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত চরমপন্থি দল ও স্থানীয় চোরাকারবারিদেরও নিয়ন্ত্রণ করে এরা।

কয়েকশ' কোটি টাকার

মালিক নজরুল ইসলাম

তালিকার শীর্ষে আছেন নজরুল ইসলাম। খুলনা চেম্বার অব কমার্সের বেশ ক'বার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি সাবেক চেম্বার সভাপতি এবং জাতীয় পার্টির নেতা এস এম এ রব হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে ৫০টির মতো চিংড়ি ঘের দখলেরও অভিযোগ আছে। খুলনা কোতওয়ালি ও মংলা থানায় তার বিরুদ্ধে হত্যা, দখলসহ বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। খুলনা শহরে তার ৫টি বিশাল বাড়ি আছে। রয়েছে খুলনার বড় বাজারে ৮টি বিশাল সুপারির আড়ত।

নজরুল ইসলামের শিপিং এজেন্সির নাম 'ব্রাইট শিপিং'। এ এজেন্সির মাধ্যমে বন্দর দিয়ে তিনি মূলত সিমেন্টের কাঁচামাল ক্লিংকার, সার ও চাল আমদানি করে থাকেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, তিনি জাহাজে পণ্য নিয়ে এসে সেই জাহাজ বন্দরে বছরের পর বছর রেখে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করেন। এভাবে ডেনমার্কের জাহাজ 'স্যাল্যান্ডার' ৫ বছর এবং রুমানিয়ার এমভি আর্ডিয়ালকে ৪ বছর বন্দরে ফেলে রেখেছিলেন।

ডেনমার্কের স্যাল্যান্ডার জাহাজটি দিয়ে নজরুল ইসলাম ৭ হাজার ১১৩ মেট্রিক টন চাল এনেছিলেন ১৯৯৯ সালের ১৯ এপ্রিল। জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে তার চুক্তি ছিল মাল খালাস করে চলে যাবে। বন্দরে জাহাজ নোঙর করলে তিনি প্রথমে মাত্র ২৯৪ মেট্রিক টন চাল গ্রহণ করেন। বাকি চাল খালাস করার ব্যাপারে গড়িমসি দেখান। বাজারে তখন চালের মূল্য কম থাকায় তিনি আর চাল না নামানোর সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে বন্দরে ছাড় পাওয়া যাচ্ছে না ইত্যাদি নানা অজুহাত দেখাতে থাকেন কোম্পানিকে। কিছুদিন চুপ থেকে জাহাজ কোম্পানি মাল খালাসের জন্য চাপাচাপি করতে থাকে।

নজরুল ইসলাম তখন জাহাজে রক্ষিত চাল নমুনা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়নি ও চালে পচন ধরছে বলে কোম্পানির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ জাহাজ কোম্পানিকে প্রতি কেজি ৫ টাকা ৮৯ পয়সা বাজারদর ধরে এবং আয়কর ও ভ্যাটসহ মোট ৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকা আমদানিকারককে দিতে বলে। জাহাজ কোম্পানি রাজি না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত chš গড়ায়। আদালতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হয় ২০০৪ সালের ১২ ডিসেম্বর। জাহাজ কোম্পানি বন্দরে ৬ ও ৮ নং ট্রানজিট শেডে ৫ বছর অবস্থান করায় শেডের ভাড়া দাঁড়ায় ৬ কোটি টাকা। আমদানিকারককে ৪ কোটি ৩৭ লাখ এবং সেডের ভাড়া বাবদ ৬ কোটি টাকা ডেনমার্কের স্যাল্যান্ডার জাহাজটি পরিশোধ করে অবশেষে বন্দর ত্যাগ করে।

অভিযোগ আছে, এই নজরুল ইসলামের কারণে কোনো কোনো সময় জাহাজ কোম্পানি জাহাজ রেখেই চলে যায়। শেষে সেই জাহাজ ব্রেকারে দিয়ে তিনি মুনাফা আদায় করেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিনিধি একাধিকবার bRi"j ইসলামের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেও তাকেও পাওয়া যায়নি।

বাগেরহাটের ত্রাস আনোয়ার হোসেন

আমদানিকারক আনোয়ার হোসেন বাগেরহাট ও মংলা এলাকায় অগাধ অর্থ ও ক্ষমতার দাপটের কারণে ব্যাপক পরিচিত। মংলা এলাকায় দুবাই সিমেন্ট নামে একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরি আছে তার। ফায়লার হাটে রয়েছে তার ৭০ বিঘা জমি নিয়ে ১০টি চিংড়ি ঘের। এছাড়া সুন্দরবনের কাঠ পাচারের সঙ্গেও তিনি জড়িত বলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানায়। আনোয়ার হোসেনের সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও জানা গেছে 'এ হোসেন গ্রুপের' নামে আনোয়ার হোসেন দীর্ঘদিন মংলায় পণ্য আমদানি করে আসছেন। 'বিশ্ব কুমদী' জাহাজকে তিনি দীর্ঘদিন আটকে রেখেছিলেন বলে স্থানীয় সূত্র জানায়।

সাধারণ শ্রমিক থেকে আমদানিকারক

ম্যাক শিপিংয়ের মালিক কামরুল ইসলাম ছিলেন সাধারণ শ্রমিক। মংলা বন্দরে দীর্ঘদিন চাঁদাবাজি, জাহাজ আত্মসাৎসহ নানা রকম অপকর্মের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী শ্রমিক নেতাদের হাতে রেখে জাহাজে রাখা মাল নষ্ট করে, সেই মালের পূর্ণ মূল্য আদায় করে আসছেন দীর্ঘদিন থেকেই। একাধিক সিমেন্ট বহনকারী জাহাজকে তিনি এভাবে আটকে রেখেছেন।

তিনি একাধিক নাম ব্যবহার করেন বলেও গোয়েন্দা সংস্থা জানায়। বন্দর এলাকায় তিনি কামরুল ইসলাম ব্যবহার করলেও খুলনা শহরে কামরুল হক হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

৪০টি ঘেরের মালিক খলিলুর রহমান

মংলা শ্রমিক সংঘের সভাপতি খলিলুর রহমানের চিংড়ি ঘের আছে ৪০টি। এসব ঘেরের বার্ষিক আয় ৬ থেকে ১০ কোটি টাকা। তিনি ঘেরের ব্যবসা ছাড়াও স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে এলাকায় টেন্ডারবাজি, জমি দখলসহ বিভিন্ন অপকর্ম করে আসছেন। বন্দর কর্তৃপক্ষ খলিলুর রহমানের ব্যাপারে এই বলে অভিযোগ করেন যে, তার নেতৃত্বে বন্দরে ২০ বারেরও বেশি ৭২ ঘন্টা করে শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয়েছে। যার ফলে বন্দরের ক্ষতি হয়েছে ৩ কোটি ৯২ লাখ ৫৬ হাজার টাকা। খলিলুর রহমান অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে শ্রমিক নেতাদের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

নিষিদ্ধ পার্টির সদস্য

শ্রমিক নেতা বয়োবৃদ্ধ আবুল খায়ের নিষিদ্ধ সংগঠন জনযুদ্ধের (এমএল) সক্রিয় সদস্য। তিনি একই সঙ্গে শ্রমিক সংঘের সহ-সভাপতি। শ্রমিক রাজনীতি করে তিনি মংলা এলাকায় আলিশান বাড়ি-গাড়ির মালিক। সাধারণ শ্রমিকরা অভিযোগ করে বলেন, প্রত্যেক শ্রমিকের মাথাপিছু মজুরি ২০ থেকে ৩০ টাকা মেরে দেয় এই আবুল খায়ের। আবুল খায়েরকে যদি ওই পরিমাণ অর্থ দেয়া না হয় তবে সেই শ্রমিকের বন্দরে কাজ জোটে না। তিনি ২০০০কে বলেন, 'আওয়ামী লীগ সমর্থন করি বলেই আমাকে এ তালিকায় রাখা হয়েছে। অথচ বন্দরের জন্মলগ্ন থেকে আমি এখানে কাজ করছি।'

বন্দরে ডক এলাকার ত্রাস রফিকুল

১১ মাফিয়ার অন্যতম বন্দর ডক শ্রমিকের সাক্ষাৎ ত্রাস মোঃ রফিকুল ইসলাম ওরফে লোহা

রফিক। তার বাবা বন্দরে লোহার ব্যবসা করতেন, সেই থেকে রফিকের নামের সঙ্গে লোহা যুক্ত হয়ে যায়। লোহা রফিকের বিরুদ্ধে থানায় একডজনেরও বেশি খুনের মামলা আছে। এছাড়া চিংড়ি ঘের এবং বাড়ি দখলের ঘটনাও তিনি ঘটিয়েছেন। তার অর্থবৈভবও চোখে পড়ার মতো। শ্রমিক সংঘের সাধারণ সদস্য হয়েও তার প্রভাব অনেক বেশি। লোহা রফিক অবশ্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগকে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ বলে দাবি করেন।

মাফিয়ার ডন শাজাহান শিকারী

গোয়েন্দা সংস্থার তালিকায় আরেকজন শাজাহান শিকারী। মোড়েলগঞ্জে আদিবাড়ি হলেও মংলা বন্দর এখন তার মূল ঘাঁটি। ৪ বার শ্রমিক সংঘের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তার ৩০টির মতো চিংড়ি ঘের আছে বলে স্থানীয়রা জানায়। নিজে অশিক্ষিত হলেও দুই ছেলে মিলন ও সুমনকে ঢাকায় রেখে পড়ালেখা করাচ্ছেন।

মংলার শামসুর রহমান রোডের একাডেমী স্কুলের (দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র) পাশে বিলাসবহুল প্রাসাদ আছে। এছাড়া তার কয়েক কোটি টাকার সম্পদ আছে বলে স্থানীয়রা মনে করেন। শিকারী ২০০০কে বলেন, 'যারা এ তালিকা করেছে তারাই দুর্নীতিগ্রস্ত।' তিনি ডিএসবি মোস্তফাকে এজন্য দায়ী করেন।

অশিক্ষিত চান মিয়া এখন কোটিপতি

স্রেফ বন্দরের শ্রমিক ছিলেন চান মিয়া। সেখান থেকে শ্রমিক সংঘের সঙ্গে জড়িত হয়ে সহ-সভাপতি পর্যন্ত হয়েছিলেন। শ্রমিকদের মজুরি অবৈধভাবে কর্তন, শিপিং কোম্পানির কাছে চাঁদাবাজি, ঘের দখলসহ নানা অপকর্ম করে আজ সে কোটিপতি। চানমিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে পাওয়া যায়নি।

ডাকাত থেকে শ্রমিক নেতা

বন্দর এলাকায় মানুষ যার নাম নিতে ভয় পায় তিনি হলেন মোয়াজ্জেম হোসেন। এক সময় ডাকাতি করতেন বলে স্থানীয়রা জানায়। গত বছর তিনি সহ-সভাপতি পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছেন। তার সম্পর্কে অভিযোগ, তিনি চরমপন্থি জনযুদ্ধ এমএলের সদস্য এবং আঞ্চলিক কমান্ডার। মংলা, বাগেরহাট ও খুলনা শহরে একাধিক বাড়ি আছে। মংলা, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট পর্যন্ত তার একচ্ছত্র প্রভাব।

মোয়াজ্জেম হোসেন স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের কাছে লিস্টেড চরমপন্থি হিসেবে পরিচিত হলেও প্রকাশ্যেই ঘুরে বেড়ান। তিনি স্থানীয় গরু চোরাকারবারি প্রধান বলে স্থানীয় বাজারের কসাইরা জানায়। কসাইরা তার কাছ থেকেই গরু কিনে থাকে। এসব বিষয় জানতে বারবার চেষ্টা করেও মোয়াজ্জেম হোসেনের সঙ্গে কথা বলা যায়নি।

শেলায় শাখার শ্রমিক কোটি টাকার মালিক

শ্রমিক সংঘ থেকে মাত্র দু'বার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুস সামাদ। বর্তমান সংঘেও তিনি একজন সাধারণ সদস্য। এলাকায় খুব একটা জাঁকজমকের সঙ্গে থাকেন না। তবে বাগেরহাটে তার ৪টি বিশাল বাড়ি আছে। ১০টি বড় মাপের চিংড়ি ঘেরেরও মালিক আব্দুস সামাদ। তিনি কোনো অপকীর্তির সঙ্গে যুক্ত নন বলে দাবি করেন।

জনপ্রিয় নেতা কিভাবে ঘাতক নেতা হলেন

স্টিভিডরস শাখায় কাজ করতেন মোঃ নূর আলম। সদালাপি ও সুন্দর ব্যবহারের কারণে শ্রমিকদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে খুব দ্রুত। শ্রমিক সংঘের বারবার সদস্য নির্বাচিত হওয়া সেই জনপ্রিয়তারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু অল্পদিনেই নূর আলমের আর একটি রূপ প্রকাশ পায়। মংলা শ্রমিক বেল্টে ৫-৭ জন শ্রমিক গত ২০০১ সালে মারা যায় তার হাতে। আর সেই থেকে নূর আলম এখন ঘাতক আলম হিসেবে পরিচিত। নূর আলম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমদানিকারকরা মংলা থেকে এলসি করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পণ্য খালাস করে খুলনা, নারায়ণগঞ্জ নোয়াপাড়ায়। আমরা এটার প্রতিবাদ করায় কর্তৃপক্ষ আমাদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নিয়েছে।'

মংলা বন্দর স্থবিরতার নেপথ্যে

সংসদীয় কমিটি ১১ জন মাফিয়াকে বন্দর স্থবির হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে দেখাতে চাইলেও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কমিটি নিজেদের মাফিয়ার নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছে না, অথচ অভিযোগ করছে। তাছাড়া এই মাফিয়ারা কিভাবে মংলা বন্দরের ক্ষতির কারণ হচ্ছে, তাও সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদনে স্পষ্ট নয়। বরং কমিটির কার্যপত্রে ডক শ্রমিক কর্তৃক হরতাল সংস্কৃতিকে মংলা বন্দরের বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কার্যপত্রে বলা হয়েছে, ১৯৮৭ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ১৭৯ বার মোট ৩২০ দিন ধর্মঘট ডাকা হয়েছে।

বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে না চাওয়ার আরেকটি কারণ জাহাজ আটক। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ পর্যন্ত বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে মোট ৩৬টি জাহাজ আটক করে। এ রোডেল নামে রুমানিয়ার একটি জাহাজ ১৯৯৯ থেকে আজ পর্যন্ত মুরিং পয়েন্টে আটকে আছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ নজরুল বা আনোয়ারের মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে জাহাজ আটকে রাখে। এরপর জরিমানা আদায় করে তা দু'পক্ষের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করা হয় বলে জানা গেছে। মূলত এরকম আরো অনেক কারণ আছে। যার মধ্যে রয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষের অদক্ষতা ও দুর্নীতি এবং নিয়মিত অনিয়মিত শ্রমিক দ্বন্দ্ব আর এসব বিষয়ের সুযোগ নিচ্ছে চিহ্নিত ঐ মাফিয়ারা। তারা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পুলিশ প্রশাসন এবং রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় দাপটের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সংসদীয় কমিটি ১১ জন মাফিয়াকে বন্দর স্থবির হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে দেখাতে চাইলেও তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কমিটি নিজেদের মাফিয়ার নাম প্রকাশ করতে চাচ্ছে না

এ প্রসঙ্গে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান রুহুল আমিন বলেন, বন্দরে কিছু মানুষের প্রভাব আছে। সে সংখ্যা ১১ বা বেশি হতে পারে। তবে ১১ মাফিয়া কারা তা আমি জানি না। তিনি আরো বলেন, শ্রমিকরা বিভিন্ন অজুহাতে কাজে বাধা সৃষ্টি করে। মংলা বন্দর স্থবির হয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বন্দরটি মূলত খুলনার পাটশিল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। পাটশিল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বন্দরও থমকে যায়। তবে এখনো ফুড, ক্লিংকার ও সুপারির জাহাজ কমবেশি আসে। বন্দর চেয়ারম্যান অবকাঠামোগত সংকটের কথা তুলে ধরে বলেন, বন্দরে গ্যাস ও রেল সংযোগ নেই, ইপিজেড অকার্যকর। বন্দরে নাব্যতা সংকট রয়েছে।

চট্টগ্রাম বন্দরের ওপর চাপ কমাতে মংলা বন্দরকে কাজে লাগানোর কোনো উদ্যোগই সরকার নেয়নি। অথচ দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এই বন্দর রাখতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি শক্তিশালী বন্দর অবকাঠামো গড়ে উঠলে জাতীয় অর্থনীতিই লাভবান হবে। সে কারণেই ১১ মাফিয়াকে নিয়ন্ত্রণ এবং বন্দরের অদক্ষতা দূর করার বিকল্প কিছু করণীয় সরকারের নেই।